Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 150– 157
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাসে অরণ্য ও আদিবাসী জীবন

হরিপদ হেমব্রম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বাঁকুড়া
ইমেইল : haripadahembram82@gmail.com

Keyword
শক্তিপদ রাজগুরু, অরণ্য, আদিবাসী, সাঁওতাল, সমাজ, আদর্শ সাহিত্যিক, সংকট, অন্যায়- অবিচার, অরণ্য-সভ্যতা।

Abstract

শক্তিপদ রাজগুরু ছিলেন বৈচিত্র্যের অনুসন্ধানী। সমাজ জীবনের নানা শ্রেণির মানুষের সুখ দুঃখের, দৈনন্দিন জীবনের ব্যথা বেদনার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। চোখে দেখা, মনে ধরা চরিত্রগুলিকে তার সৃষ্টি উপন্যাসগুলিতে রূপ দিয়েছেন। উপন্যাসের প্রেক্ষাপট রচনায় বৈচিত্র্য যেমন এসেছে। তেমন মানব চরিত্র রূপায়নেও সমান দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি যা দেখেছেন, তাই লিখেছেন। যা দেখেননি তা লেখেননি। দীর্ঘ সত্তর বছরের সাহিত্য জীবনে তিনি প্রয়া তিনশোর বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বহু নামী দামী পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। মানুষ হিসেবে বড় মাপের মানুষ। তিনি সহজ সরল জীবন যাপন করতেন এবং মমত্ববোধ যেমন তার লেখায় ফুটে উঠেছে, তেমনি গ্রাম-শহর-জঙ্গল ও অরন্য প্রেমী আদিবাসী সকল মানুষের জীবন সংগ্রামকে মর্যাদা দান করেছেন সাহিত্য আর সিনেমার মধ্য দিয়ে। আর এভাবেই একবর্ণময় ব্যক্তিত্বের খ্যাতি শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা ভারতে ও বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

শক্তিপদ রাজগুরুর জন্ম ১৯২২ সালে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বড় জোড়া থানার গোপবান্দী গ্রামে।৯২ বছরের আয়ুস্কালে, সত্তর বছরের সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন থেকে তিনি ছোট গল্প উপন্যাস মিলিয়ে ২৪৫টি রচনা সম্পূর্ণ করেছেন। স্বীয় প্রতিভাগুনে তথা কর্মদক্ষতার বলে তিনি বাংলা সাহিত্যাকাশে এমনকী চলচ্চিত্র জগতেও বিশেষ স্থান অধিকার করে নেন। তার উপন্যাসে বেশিরভাগের প্রেক্ষাপটই নবগঠিত গ্রামবাংলা বা কলোনী ও অরন্য কেন্দ্রিক। তিনি তাঁর উপন্যাসে দেশ-কালের বিচিত্র রূপও পরিবর্তনের বহু ঘটনা চিত্রিত করেছেন। রাজতন্ত্র, জমিদারি প্রথা, পুঁজিপতি শ্রেণি, গ্রাম কেন্দ্রিক কুটির শিল্পের শ্রমিক, খনি ও কলকারখানার শ্রমজীবী, অরন্যে বসবাসকারী আদিবাসী, স্বাধীনতাকালে মুষ্টিমেয় চরম সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতাদের উত্থান, জঙ্গলমহল ও সুন্দরবন অঞ্চলের উন্নয়নের অভাবে সেখানকার মানুষের করুণ দুর্দশা এবং সর্বোপরি নিজ জেলা বাঁকুড়ার ব্রিটিশ থেকে বামফ্রন্ট আমল পর্যন্ত অভিজ্ঞতা তিনি তার গল্প, উপন্যাসে তুলেধরেছেন।

শক্তিপদ রাজগুরুর একাধিক উপন্যাসের মধ্যে অরণ্য ও আদিবাসী জীবন কেন্দ্রিকগুলো হল, 'শবরীর তীর হতে', 'বাসাংসি জীর্নানি' (১৯৬৬), 'হাতি বোঙার অরণ্য' (১৯৮৬), 'আদিম আশ্রম' (১৯৮৫), 'কিছু পলাশের নেশা' (১৯৮৯), 'বনে বনান্তরে' (১৯৮৯), 'নীল নির্জন' (১৯৯০), 'কাঁসাই এর তীরে' (১৯১৬),"""সওদাগর" (২০০৪), 'রায়মঙ্গল' (১৯১২)। উত্তরবঙ্গের আরণ্যক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে 'অনুসন্ধান', 'অনিকেত', 'উত্তরের পাখি', প্রভৃতি। এছাড়াও সুন্দর

বনের প্রেক্ষিতে 'রায়মঙ্গল'',নয়াবসত,''নোনাগাঙ', 'খলসেমারির গঞ্জ', 'গহিন গাঙ','চরহাসিল'ইত্যাদি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

Discussion

সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ বলা হয়। সমাজবোধ নিয়েই স্রষ্টা সৃষ্টি করেন সাহিত্য। সমাজের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি কান্না, জ্বালা যন্ত্রণা, বেঁচে থাকার সংগ্রামের কথা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। আদর্শ সাহিত্যিক সমাজের উত্থান-পতন, আলো-অন্ধকার কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। শাসক শ্রেনির অন্যায় অবিচার অত্যাচারের ফলে শোষিত বঞ্চিত শ্রেনির দুরবস্থা তিনি দেখেন। কালের গতিতে আবার পরিবর্তন আসে। আন্দোলন বিক্ষোভ বিপ্লবের ঢেউ পুরাতন সমাজকে নতুন করে গড়ে। পরিবর্তন প্রগতি নাম ধারন করে।

সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু বাংলা সাহিত্যের একজন সমাজ সচেতন শক্তিমান লেখক। তাঁর গল্প উপন্যাস কথা সাহিত্যে সমাজ বোধের প্রচুর উজ্জ্বল উদাহরণ পাওয়া যায়। পূর্বসূরি লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুসরন করে অরন্য ও আদিবাসী সমাজ জীবনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। আবার তারাশঙ্করের সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে মিশে গ্রামীণ সমাজ জীবনের গতি প্রবাহ অভিব্যক্তি করেন স্বরচিত সাহিত্যে। তিনি মানুষকে ভালোবাসেন, সমাজকে ভালোবাসেন, তা সে জন্মভূমি গোঁপবান্দী গ্রামের মানুষের হোক, কিংবা সুন্দর বনের হাড়হিম করা পরিবেশে বাঁওয়ালি হোক। আবার দণ্ডক থেকে মরিচঝাঁপির ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষ হোক। আসানসোল – রানীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লাখনির মালকাটা অথবা পাশ্চাত্য দেশে ভোগবাদী সভ্যতায় বেঁচে থাকা প্রবাসী ভারতীয়দের শূন্যতার হাহাকারের কান্নাভরা মানুষটি হোক।

শক্তিপদ রাজগুরু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত প্রকৃতিকে ভালবেসে এবং আদিবাসীদের অরণ্যচারী জীবনের প্রতি কৌতূহলী হয়ে তিনি পারান্ডা, মধুমাল্লাই, কানহা, গির, মধ্যপ্রদেশের মালখান গিরি, পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের বনাঞ্চলে, সুন্দরবনের বিপদ সংকুল দ্বীপ অঞ্চলে প্রকৃতি অরণ্যে ভ্রমণ করেছেন। এ বিষয়ে তার লেখা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল – 'হাতিবোঙ্গার অরণ্য'। এই উপন্যাসটি - সারান্ডার অরণ্য জীবনের অপরূপ কাহিনী। এতে দেখা যায়। আদিম চেতনার সংস্কারে আচ্ছন্ন আদিবাসী মানুষ, অরণ্যের বিভীষিকা ও সৌন্দর্য। অরন্য জীবনের বাধা বিঘ্ন, কঠিন সংগ্রামরত জীবন আর অরন্যচারী নরনারীদের প্রেম ভালবাসা, স্বপ্ন, সাধ, আশা আকাঙ্খ নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন ও অনিশ্চিত জীবন কথা নিপুন লেখনীতে মরমী কথাশিল্পী রাজগুরু মহাশয় ফুটিয়ে তুলেছেন।

> "মানুষের সভ্যতার জন্মদাতা ওই অরন্য। আদিম সূর্যরশ্মিকে বুকে ধরে সেই পর্যাপ্ত শক্তি থেকে জন্ম নিয়েছে অরন্য জগৎ কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে, গড়ে তুলেছে তপোবনের সভ্যতাকে। মানুষের আদি ইতিহাসকে। জীবনের প্রথম উন্মেষ ঘটে সেইখানে – স্নিগ্ধ সহজ অরন্যে।"[১]

অরন্যের যেমন একটা ইতিহাস আছে, ইতিহাসেও তেমনি অরন্য জায়গা করে নিয়েছে। বর্তমান সময়ে অরন্য সভ্যতা কিভাবে ধংস্ব হচ্ছে। বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে অরন্য নিধনের হার ব্যাপকতম। দ্রুত শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে অরন্যাঞ্চলে কয়লা, লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থলোভী সরকারী দুষ্কৃতিরা অরন্যকে ধ্বংস করে। কিন্তু আদিবাসীরা শুকনো বা সামান্য ডালপালা ছাঁটলেও গাছ কাটে না। অরন্যের হানি করে না। আজ মানুষের সভ্যতা সেই চিরন্তন জীবনকে বিঘ্নিত করছে। আজকের লোভী মানুষের হাত তাকে শেষ করতে চায়।

চাইবাসা সারান্ডার জঙ্গলের আদিবাসী শ্রমজীবী মানুষ খনি থেকে লোহা ওম্যাঙ্গানিজ আকরিক এবং বন থেকে দামি শাল, সেগুন ইত্যাদি কাঠের লগ হিংস্র বন্য জন্তুর সঙ্গে লড়াই করে ছিনিয়ে আনে সার্ভেয়ার বিজয় দত্তের সঙ্গে ডাক্তার রমেশদত্ত ও করুনাময়ী দেবীর কন্যা নন্দিনীর মেলামেশা, ভালবাসা ও শেষে বিয়ে হয়। এরপরএকদিন কানু সর্দারের আমন্ত্রণে ঘন জঙ্গলে তারা ডুংরিতে যায়। সঙ্গে অর্জুনমুন্ডা ও বাঁশরীমুন্ডাতাদের সাথে চলে। ঘন জঙ্গলে সর্বত্র আঁধার জড়ানো পরিবেশ, অবিরাম ঝি ঝি পোকার ডাক শোনা যায়। কটরা হরিণ, সম্বর, বিশাল দাঁতালো হাতির পাল, দুর্দান্ত বাইসন, বুনো শুয়োর, বাঘ ইত্যাদি জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ গভীর অরণ্য। বিজয়ের চোখ দিয়ে লেখকের কাছে এ

অরণ্য মহা তীর্থভূমি। আদিবাসী সমাজের রীতিনীতি, সংস্কার, জীবনযাত্রা সবকিছু খুব কাছ থেকে দেখে বিজয় ও নন্দিনী। আদিবাসীরা হাতিদের উপদ্রব থেকে বাঁচবার জন্য হাতিবোঙার তথা দেবতার পুজো দেয়। তাদের পোশাক বলতে কোমরে জড়ানো একফালি ন্যাকড়া আর খাদ্য হিসেবে গুদলু আলু সেদ্ধ, মহুয়া বা বনের কন্দমূল সেদ্ধ। ভাত তাদের কপালে জোটে না।

ডুংরি সর্দারের ছেলে বিষণ মুন্ডা অন্য ধাতের মানুষ। সে শহুরে জীবনের দিকে আকর্ষণ বোধ করে। শহরে এসে সে বিজয়ের কাছে আশ্রয় পায়। অন্যদিকে আদিবাসী সমাজচ্যুত মা-বাবাহারা সারিন শহুরে বাবুদের বাড়িতে কাজ করে। তার সঙ্গে বিণের আলাপ পরিচয় হয় এবং শেষে বিয়ে। হয়। তাদের সন্তানও জন্মায়। এদিকে হাতিদের উপদ্রবেসমাজচুতমা-বাবাহারাসারিনশহুরে বাবুদের বাড়িতে কাজ করে। প্রতিশোধ পরায়ণ সাইলো গুনীন এজন্য দায়ী করে বিযাণ ও সারিনকে এবং প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেয়। বিণকে জঙ্গলে ডেকে আনা হয়। তার মধ্যে অরণ্যের আদিম সংস্কার জেগে ওঠে। সে স্ত্রী পুত্রকে ছেড়ে জঙ্গলে চলে আসে বোঙা দেবতার কাছে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। জঙ্গলে গাছের উপর আশ্রয় নিয়ে বুনো খরগোশ - শজারু – পাখি মেরে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। এদিকে সারিন সপুত্রক বিযানের খোঁজে জঙ্গলে ছুটে আসে। বনের হিংস্র মাকনা ও দাঁতাল হাতির খপ্পরে পড়ে যায় দুজনে। দাঁতালবিযাণকে এবং মাকনাটাকে সারিনকে পিষে মেরে ফেলে। তাদের ছেলেটাও হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে মাটিতে মিশে যায়।

এভাবে লেখক সারান্ডার জঙ্গলের পটভূমিকায় মানব-মানবীর এক বিয়োগান্তক প্রেম কাহিনী রচনা করেছেন। সারান্ডার জঙ্গলে গিয়ে আদিবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করে লেখক বাস্তব অরণ্য জীবনের পটে কল্পনার রঙে প্রণয় চিত্র এঁকেছেন। অরণ্যের সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর রূপের কথা পাঠকদের কাছে উপন্যাসটিকে আকর্ষনীয় করে তুলেছে।

‘বনে বনান্তরে’ উপন্যাসটি পালামৌ জেলার ডালটনগঞ্জে বেতলা ফরেসে নিজস্ব অভিজ্ঞতাভিত্তিক কথাচিত্র। দন্ডকারণ্যতে লেখক উদ্বাস্ত কলোনীর অবস্থা অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে গভীর অরন্য ও আদিবাসীদের কথা চিত্রিত করেছেন ‘শবরীর তীর হতে’ উপন্যাসে। আবার উত্তরের তরাই অরণ্যের উপর পটভূমিকায় শক্তিবাবু লিখেছেন অনুসন্ধান, অনিকেত ও উত্তরের পাখি উপন্যাস।।

‘নীল নির্জন’ লেখকের অরন্যকেন্দ্রিকউপন্যাস। তিনি পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে বেড়াতে যান। সেখানে থাকেন ফরেস বাংলোতে। এই পাহাড়ের বনভূমি অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গেও সীমানা ও ঝাড়খন্ডের কিছুটা অংশনিয়ে। অযোধ্যায় নির্জন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের আকর পার্বত্যভূমিতে বেড়াতে গিয়ে বহু মানুষের সঙ্গে পরিচিত হন।

> “মানভূম সিংভূম বীরভূম বাঁকুড়া পুরুলিয়া অঞ্চলে বহু সাঁওতাল আছে এই অযোধ্যা তীর্থে। এটা তাদের কাছে তীর্থস্থান। মাঠের ধারে পাহাড়ের নীচে আজও সাঁওতালদের গড়ের বংসাবশেষ রয়ে গেছে। আর আছে পবিত্র ধর্ম। এখানে এরা স্নান করে পূজা দেয়। তার পর শুরু হয় ভোর থেকে। ওদের শিকার পর্ব।”[২]

বিশেষত পার্বত্য আদিবাসীদের মুখে দুঃখ বেদনার কথা যা তিনি শুনেছেন তাবিবৃত করেছেন। লেখক এখানে বিভূতিভূষণের আরণ্যকের রাঙা সর্দারের মতো আদিবাসী সাঁওতাল সর্দার মুশাই মাঝিকে দেখেছেন যিনি পাহাড়ি লোকগুলোর জন্য বেদনার্ত ও তাদের সুখ আর মঙ্গলের জন্য ব্যাকুল। এছাড়া দাবি দাওয়াহীন মুখ বুজে কর্তব্যরত রাজু চৌকিদার, ভালবাসার নাগরের শহর থেকে ফিরে আসার প্রতীক্ষায় চাতক পাখির মতো কাতর যুবতী বুধিয়া এবং সব হারিয়ে বেদনায় বিহ্বল ফণা নায়েক লেখকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আবার বিপরীত ধর্মী চরিত্র দেখা গেছে লোভী রতন মাঝি ও কামতা প্রসাদের মধ্যে যারা আদিবাসীদের ঠকায় ও শোষন করে। মদের নেশায় আসক্ত রাজু খাড়িয়া বনপথে দলছুট মাকনা হাতির সামনে পড়ে কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে যায়। লেখকের এ প্রসঙ্গে কৌতুকপূর্ণ মন্তব্য মানব চরিত্রের রূপকে উদাঘাটিত করে তোলে। এই উপন্যাস আযোধ্যার পাহাড়ি অরণ্যের পটভূমিতে লেখা যেখানে তিনি সমস্ত অরন্য ভ্রমণ কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। নীলনির্জন উপন্যাসটি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর করুন দুঃখময় জীবনের জীবন্ত দলিল।

‘কাঁসাই এর তীরে’ উপন্যাসটির প্লট নির্মিত হয়েছে দক্ষিণ বাঁকুড়ার কসাই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অরণ্যময় জীবনের পটভূমিকায় কংসাবতী জলাধার গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে। উপন্যাসের নায়ক তথা প্রধান চরিত্র হলো আদিবাসী যুবক বদন। উপন্যাসের এই বদন চরিত্রটি কাল্পনিক নয়। বাস্তবে লেখকের সঙ্গে বদন বলে এক আদিবাসী মানুষের

পরিচয় হয়েছিল। বদন তার পূর্ব জীবনের ইতিবৃত্ত লেখককে বলেছিলেন। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদনীপুরের প্রান্ত সীমায় কাসাই তথা কংসাবতী নদীর তীরে আদিবাসীদের ডুংরি গ্রাম। আদিবাসী ছেলে অরন্যের সন্তান বদন অরন্য কন্যা কিশোরীকে ভালোবেসে ধনী ক্ষমতাবান সুধন্য রায়ের অন্যায় ভাবে জঙ্গলের গাছ কেটে শহরে চালান দেওয়ায় অন্যায় কর্মের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে যড়যন্ত্রের জালে বদনকে জেলে যেতে হয়। জেলে বন্দি ডাকাত সর্দারের সঙ্গে পরিচয় হয়ে তার দলের সঙ্গে জেল ভেঙ্গে পালিয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে সে বড় ডাকাত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে বদনের প্রেয়সী কিশোরী সুধন্য রায়ের ছেলে ত্রিনাথের লালসার হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে বাঁধের গভীর জলে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। এর পর বদন প্রতিশোধের আগুনে। শত্রুদের বংস করতে তৎপর হয়। পুলিশ প্রশাসন ও অসৎ ধনী ব্যক্তিদের কাছে সে ত্রাসের কারণ হয়ে ওঠে। কাসাই বাঁধ দেওয়ার ঠিকাদারি কাজে মতিবাবু, ত্রিনাথ, নকুন সাহা, ভবানী মুখুজ্যের মতো ঠিকাদাররা দু পয়সা কামিয়ে নেয়। বদন তার দলবল নিয়ে অসৎ ঠিকাদারদের টাকালুট করে। পুলিশ তাকে কিছুতেই ধরতে পারে না। একদিন বদনের টাঙির ঘায়ে ত্রিনাথ খুন হয়। কিশোরীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়। খুনের আসামী হিসাবে বদনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। বদনের দুঃসাহসী বেপরোয়া চরিত্রটি রোমাকিতায় রসপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রথমে কিশোর, পরে কিশোরীর বন্ধু কুচি ও মংলির সঙ্গে সম্পর্কের রসায়নে। উপন্যাসের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল সৎ দারোগা, নরেশবাবু, নকুল সাহার ছেলে বিজয়, কংসাবতী প্রজেক্ট অফিসার সমরেশ বাবু ও তাঁর স্ত্রী সুলতা দেবী।

উপন্যাসের কাহিনী আলোচনায় নায়ক বদন চরিত্রে জীবন সংগ্রাম প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে আদিবাসী অন্ত্যজ নামব সমাজের একটি সামগ্রিক জীবন চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে। আদিবাসী অন্ত্যজ মানুষগুলো সমাজের ঠিক কোন স্থানে রয়েছে, তাদের জীবন সংগ্রাম যাত্রা প্রনালী কীরকম সবই উপন্যাসটি নিবিড় পাঠেই উপলব্ধ হয়।

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা যে সমাজে যতটাপিছনের সারিতে অবস্থান করেতাশক্তিপদ রাজগুরুর 'কাঁসাই-এর তীরে' উপন্যাস কাহিনীতে স্পষ্ট। সুদীর্ঘকাল থেকে সমাজে যে শ্রেণি বৈষম্য ও বর্ণ বৈষম্য বিরাজ করছে তা আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সমাজের নানান সুবিধা ভোগ থেকে বঞ্চিত করেছে এই উপন্যাসে তাই দেখা যায়। নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই শ্রেণিভিত্তিক এই সমাজ ব্যবস্থাকে তৈরী করে সুধন্য রায়ের মত ছল-কুচক্রী শয়তানগোছের জমিদাররা বদনদের মত সাধারণ দুঃখী দরিদ্র আদিবাসী থেকে সমাজে বঞ্চিত করে রাখে। কাসাই নদীর ওপর জলাধার নির্মাণ কার্য এলাকায় এক উন্নয়নেরই ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু এই পরিবর্তনের ঢেউ সমাজের সব শ্রেণির মানুষের গাছে এসে লাগেনি। সমাজের আদিবাসী সাঁওতাল সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা সর্বদা এই উন্নয়নের আওতার বাইরে থেকেছে। সেই কারণেই তারা আনন্দ করতে পারেনি এবং তাদের অন্তরে ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। একদিকে কাসাই নদীতে জলাধার নির্মানের মত উন্নয়নের কর্মকান্ড চলছে, আর ঠিক তার বিপরীতে তারই তীরবর্তী এলাকায় সাধারণ আদিবাসী অন্ত্যজ মানুষেরা বঞ্চনার শিকার হয়ে জীবন অতিবাহিত করে। এই উপন্যাসের কাহিনীতে দেখা যায় আদিবাসী মানুষেরা যখন এতটা দারিদ্র্য যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে জীবনটাকে কোনক্রমে অতিবাহিত করে, গাছের পড়ে থাকা শুকনো ডালপালা, পাতা বিক্রী করে অতি ন্যূনতম কিছু রোজগারের মাধ্যমে সংসার চালায়-সেখানে সমাজের ধনী-উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় প্রতিনিধিকু-চক্রী ক্ষমতাবান সুধন্য রায়ের মত শত জমিদারেরা অন্যায় পথে জঙ্গলের জমি, দামি গাছ কেটে শহরে চালান দেয়। রাতের অন্ধকারে তাদের এসব চোরা কাজের রমরমা শুরু হয়। পুলিশকে তারা টাকার জোরে নিজেদের আয়ত্ত্বে রাখে। এই সব প্রতারক গোষ্ঠীর মানুষগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজটুকুও যদি ওঠে - তখন তারা ছলে বলে কৌশলে নিমেষের মধ্যেই সেই প্রতিবাদীর বাকরুদ্ধ করে। উক্ত উপন্যাসেঠিক তেমনটাই ঘটে বদনের সঙ্গে। প্রতারক ছলনাকারী জমিদারদের অন্যায় চোরাচালানকে বন্ধ করতে অরন্য উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সাঁওতাল যুবক বদন গর্জে ওঠে –

> "গাছের কাছে যে আসবেক তাকে টাঙ্গি দিই ফাড়ি দিব।"[৩]

আদিবাসীরা সামান্যতম প্রতিবাদী হুঙ্কার তুললে তাদের নেতা বদনকে মিথ্যা জাল কেসে জড়িয়ে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সরল প্রাণা– দরিদ্র অসহায় আদিবাসী সমাজকে কুচক্রী ক্ষমতাশালীরা যে চিরকাল বঞ্চিত করে রেখেছে তাই নয়, সদাসর্বদাতারা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের ওপর অত্যাচার – নিষ্পেষণ চালায়। শক্তিপদ রাজগুরুর ‘কাঁসাই এর তীরে’ উপন্যাসটিপর প্রতি পদে পদে এর প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়। উক্ত উপন্যাসে দেখা যায় জমিদার সুধন্য রায়ের নারী লোলুপ স্বাভাবেরবিশ্রী চিত্র।

> “কিশোরীর দিকেও তার নজর ছিল। স্বপ্ন দেখেছিল সুধন্য রায় একদিন মেয়েটার অনাঘ্রাত যৌবনকে সেই লুট করে নিবে। তার জন্য ধাপে ধাপে এগিয়ে ছিল সে।”[৪]

বদনের স্ত্রী কিশোরীর প্রতি তার নাংরা দৃষ্টিপাত। বদনকে ছলনার সাহায্যে প্রতারিত করে জেলে পাঠিয়ে সুধন্য রায় কিশোরীকে নিজের আয়ত্তে নার জন্য চেষ্টা চালাতে থাকে। কিশোরীকে একা পেয়ে। তাকে ছিড়ে খাবার জন্য শেয়াল-কুকুরের দলের মত সুধন্য রায় এবং তার সাকরেদরা উঠে পড়ে লেগে যায়। যার ফল স্বরূপ নিজের আত্মসম্মানকে বাঁচাতে কিশোরী আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। আদিবাসী মেয়ে কিশোরী দরিদ্র অসহায় হতে পারে কিন্তু আপন ইজ্জতকে সে হারায় না। পাপী অত্যাচারীদের হাত থেকে রক্ষা পেতে কসাই এর জলে তার নিস্পাপ দেহকে তলিয়ে যেতে হয়। এই উপন্যাসটিতে নারী লোলুপ জমিদারদের লালসায় বলি হতে দেখা যায় কুর্চি নামক অপর এক নারীকে। তথা কথিত ভদ্র সমাজের সদস্য গদাই ও পটলা তাকে রাতের অন্ধকারে নির্মমভাবে ধর্ষণ করে হত্যা করে।

‘কাঁসাই এর তীরে’ উপন্যাসে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদনীপুর সীমান্তে কাসাই নদীর তীরবর্তী আদিবাসী জাতি গোষ্ঠীর ইতিবৃত্তকে অসাধারণ ভাব ভাষার দ্বারা নিখুতভাবে উপস্থাপন করেছেন। সেই কারণে শক্তিপদ রাজগুরুর কলম থেকে জন্ম নেওয়া এই ‘কাঁসাই এর তীরে’ উপন্যাসটি বাংলা উপন্যাসের জগতে তাকে একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

‘সওদাগর’ উপন্যাসটির আখ্যান জঙ্গল জীবনকে নিয়ে। উপন্যাসের শুরুতে ভূমিকাপত্রে লেখকের অরন্য প্রীতির ও অরন্যবাসী মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা বোধের পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

> “আদিম অরন্য আর পাহাড়ের মধ্যে মানুষ গিয়ে যুগ যুগান্তরে সঞ্চিত প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের কাজ শুরু করেছে। তাদের লোভী হাত বিপন্ন করেছে অরন্য প্রকৃতি এবং সেখানের আদিবাসীদের। যন্ত্র দানবের গর্জনে নীরব প্রকৃতির শান্ত পরিবেশ আজ বদলে গেছে। কিন্তু সেই লুণ্ঠনকারীদের লোভ থামেনি বরং বেড়েই গেছে। তারা প্রকৃতির বুক থেকে সোনার সন্ধান করতে চায় পাহাড়কে চূর্ণ করে, অরন্য জগৎকে মুছে দিয়ে। সেই স্বর্ণ মৃগয়ার শেষ নেই। তারা বন শেষ করে চরম আঘাত হানে অরণ্য প্রেমী, আদিবাসী মানুষদের পর। নিজেরাও বিপন্ন হয়, তবু স্বর্ণ সন্ধান থামে না। এমনি দিনে সে আবিস্কার করে যে সোনার সন্ধানে তারা ঘুরছে, কিন্তু তার চেয়েও দামি কিছু রয়েছে মানুষের অন্তরে। এতদিন বাইরেই খুঁজেছে পাগলের মত, তার অন্তরের স্বর্ণ স্পর্শের অনুভূতি সে পায়নি। আর তা হল ভালোবাসা - প্রেম।”[৫]

উপন্যাসের কাহিনী এই রকম। সমরেশ মাইন ইঞ্জিনিয়ার। সেকোলিয়ারির মালিক মি. মুখার্জীর মেয়ে সবিতাকে ভালবাসে, বিয়ে করতে চায়। অন্যদিকে মি. মুখার্জী নিজের একমাত্র কন্যাকে কোলিয়ারির মালিকমি. চ্যাটার্জীর ছেলে বিদেশ থেকে পাশ করা অমিতকেই জামাই করতে চায়। সমরেশ সাহস করে একদিন বিয়ের প্রস্তাব জানাতে গিয়ে মি. মুখার্জীর কাছে অপমানিত ও বিতাড়িত হয়। এরপর সে আসানসোল কোলিয়ারি অঞ্চল পরিত্যাগ করে। সে চলে যায় আদিবাসী মুন্ডাদের অরন্য অঞ্চলে। সেখানে লোহা ম্যাঙ্গানিজ খনির জিওলজিস বন্ধু নিরাপদ তাকে আশ্রয় দেয়। তারপর সমরেশ এই আদিবাসী অঞ্চলে খনি থেকে সম্পদ উত্তোলনের কাজে সাফল্যের পথে এগিয়ে যায়। প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে করতে তার আকাঙ্খ বেড়ে যায়।

এদিকে সমরেশের প্রাক্তন প্রেমিকা মদ্যপ স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে পিতার মৃত্যুর পর যাবতীয় সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে মুক্তির আশায় ফাদার ফসারের সেবাকেন্দ্রের কাজে যুক্ত হয়। চলে আসে ফুলডুংরিতে সমরেশের কাছাকাছি। সমরেশ অর্থবান প্রেমিকার বাবার কাছে প্রত্যাখ্যাত অপমানিত হয়ে মনের ভিতরে জমে থাকা ক্ষোভে সবকিছু ছিনিয়ে নিতে চায়, প্রেম-ভালবাসার মানবতার কোন মূল্য নেই তার কাছে। তাই সে সোনাবুরু নদীতে বাঁধ

দিয়ে সোনাবুরু বোঙার আদিবাসীদের দেবতার পবিত্র স্থান ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে তার নীচে স্বর্ণখনির সন্ধান পেতে চায়। বন্ধু নিরাপদ তাকে এরকম অন্যায় কাজ থেকে বিরত হওয়ার জন্য বোঝায়। এতে আদিবাসীরা ক্ষেপে ওঠে। নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে তাদের চাযের খেত শুকিয়ে যায়, পানীয় জল লাভের পথ বন্ধ হয়ে যায়। জলের জন্য হাহাকার দেখা দেয়। আদিবাসীদের সমাজ ঐক্যবদ্ধ ভাবে সকলে সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে বাঁধ ভেঙে দিতে এগিয়ে আসে।

অফিস কর্মচারী পরিতোষ বাবুর বোন তনুশ্রী সমরেশ বাবুর বাংলোতে কাজের মেয়ে আদিবাসী যুবতী কুঁদালিকে পড়াতে আসার সূত্রে পরস্পরের প্রতি ঘনিষ্টতা জন্মায়। আবার কুঁদালিকে ভালবেসে আদিবাসী যুবক মুন্ডা। বোরাই সর্দারের ছেলে কানাই কুঁদালিকে পেতে চায়। সে জন্য সে যড়যন্ত্রের জাল তৈরী করে। শেষ অধ্যায়ে দেখা যায় সমরেশ বাবুর কাছে বুদালি ও মুন্ডা পর্যন্ত ক্ষুদ্ধ হয়ে তাকে পরিত্যাগ করে। তনুশ্রীর কথাও সমরেশ শুনে না। তখন তনুশ্রী সবিতার সাহায্য চায়। সবিতা সমরেশের কাছে এসে পুরনো প্রেমিককে দেখে অবাক হয়ে যায়। এরপর সমরেশ যখন সবিতার অনুরোধে কান না দিয়ে একগুঁয়ে ভাবে এগিয়ে যায় তখন হঠাৎ মুন্ডার নিক্ষিপ্ত বল্লমটা ছুটে এসে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সবিতার পেটে লাগে। সবিতা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে এটুকু সান্ত্বনা পায় যে সমরেশকে তবু স্বর্ণ সওদাগিরির হাহাকার থেকে স্নিগ্ধ সবুজের সোনার চেয়ে দামি জীবনের সন্ধান দিয়ে গেছে সে।[৬]

শক্তিপদ রাজগুরু 'সওদাগর' উপন্যাসটি পুরোপুরি বাস্তব অবাস্তবের সংমিশ্রণে একটি সিনেমাধর্মী কাহিনী। উচ্চাঙ্গের খাঁটি সাহিত্য রসের অভাব থাকলেও, উপন্যাসের মধ্যে আদর্শবোধ – ভালবাসা বা প্রেমের মর্যাদার মূল্যের দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। সমরেশ, সবিতা ও তনুশ্রী উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এবং পার্শ্ব চরিত্রগুলি হল নিরাপদ, মুন্ডা ও কুঁদালি। চরিত্র চিত্রণ, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও পাত্র-পাত্রীর কথোপকথন সাবলীল।

'রতন মনি রিয়াং' উপন্যাস লেখকের ত্রিপুরার রিয়াং আদিবাসী গোষ্ঠীর জীবন ও আরণ্যক পরিবেশের পটভূমিকায় লেখা। শাসক শ্রেণির অন্যায় অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে গীতার ভাবাদর্শে জটাজুট গেরুয়া বেশধারী রতন মনির চারপাশে থাকে শক্তিরায়, সর্বজয়, তৈল, নয়ন্ডী, মৈতুল প্রমুখ অনেকে। অত্যাচারী খগেন রায়, রাজপ্রসাদ একজোট হয়ে রতনমনির বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করে এবং রিয়াংদের উপর অত্যধিক কর ভার আরোপ করে, জিনিসপত্র লুটপাট করে নেয়, হাতি তাড়ানোর জন্য মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। ইংরেজদের অনুগত রাজশক্তিকে আঘাত করলে ইংরেজ সরকার তার কাহিনী নিয়ে রতনমনিকে বন্দী করে। এরপর আগরতলায় নিয়ে আসারপথে রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারে তরনমনি মারা যায়। কিন্তু সত্যকে কোন দিনই বিনাশ করা যায় না। রতনমনি নেই কিন্তু তার স্বপ্ন ব্যর্থহয়নি। উত্তরকালের মানুষ তারই সাধনার ফলশ্রুতি হিসেবে পেয়েছে মহান একটি উত্তরাধিকার, স্বাধীনতার অধিকার। এই উপন্যাসটির সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' এর কথা যাতে বীরসামুন্ডা ও রতনমণির মত আদিবাসীদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে জাগাতে চেয়েছিলেন এবং রতনমণির মত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে বীরসাও পুলিশের নিষ্ঠুর পীড়নে মারা যান। তবুও ত্রিপুরার নির্জন অরন্য মর্মরে আজও ভেসে ওঠে কোন আদিবাসীর গান –

"জগনি গুরু সে অব
মানিয়া মুনছে।
রতন গুরু সে অব"[৭]

ডম্বুরুর তীর্থমুখে আজও ওরা স্মরণ করে সেই পুন্যনাম। রতনমনি আজও সেখানে বেঁচে আছেন ঞ বহু মনের উজ্জ্বল স্মৃতিতে জীবন দেবতার পদ প্রান্তে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর নমস্কারের বিনম্রতায়।

'রায়মঙ্গল' হল সুন্দর বনের প্রেক্ষাপটে লেখা লেখকের একটি বিখ্যাত উপন্যাস। সুন্দরবন অঞ্চলের একটি নদীর নামে এই উপন্যাসের নামকরণ। এর কাহিনীটি হল মোটামুটি এরকম। ভিকন মানভূমের ফুলডুংরির মানুষ, জাতিতে সাঁওতাল। তার ভালবাসার মনের মানুষ সোঁদাল কাজের খোঁজে আড়কাঠির মাধ্যমে সে সুন্দরবনে এসে পড়ে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তার সোঁদলের কথা মনে পড়ে। গোমস্তা থেকে হঠাৎ জমিদার হওয়াহরষিত পানের সে অলিখিত বন্দি দাস। তাই দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে স্বভূমিতে ফিরে যেতে পারে না। রায়মঙ্গল নদীর ধারে সাহেবখালিতে সে চায়। করে, কিন্তু তার শ্রমের ফসল সব লুট করে নেয় জমিদারের লোকেরা। হরষিত পান ও তার সাগরেদ মানিক

শিকারী বে-আইনিভাবে পূর্ব বাংলায় মাল কেনাবেচার কাজ করে। জঙ্গলের কাট কেটে গোপনে বিক্রী করে। মাঝে মাঝে জল-পুলিশের হাতে ধরা পড়লে বিপদ ঘটে।

> “সেই আদিম আরন্যক পরিবেশেও মানুষ বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে।”[৮]

মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে জীবনকে স্বীকৃতি দেয় বাদাবনের বাউলিয়া, মধু নৌকার ফেরারী মাঝি, আবাদের চাষীমানুষ। চিরান্ধকার রন্যে জীবন আর মৃত্যু অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত। রায়মঙ্গল সেই অন্ধকার অরন্যে আনে গতির প্রকাশ।

এছাড়াও রাঢ় অঞ্চলের দুর্গাপুরের পটভূমিকায় শক্তিবাবু লিখেছেন ভাঙাগড়ার পালা, সমুদ্র শঙ্খ, শেষ নাগ, স্বপ্নের শেষ নেই প্রভৃতি। আবার ট্রিলজি উপন্যাস হল বাসাংসি জীনানি, রূপান্তর ও শেষনাগ। ‘বাসাংসি জীর্নানি’ উপন্যাসের পটভূমি দামোদর নদের তীরবর্তী গোপ গাঁতথা লেখকের জন্মভূমি গয়লা বাঁধ বা গোপবান্দী গ্রাম। জঙ্গল কেটে তখন সবে দুর্গাপুর শিল্পনগরী গড়ে উঠেছে। কারখানায় কাজের খোঁজে গ্রামের মানুষ ছুটে আসছে। কৃষি সর্বস্ব সমাজ জীবনে শিল্পের প্রভাবে রূপান্তর এসেছে।

> “বসন জীর্ন হয়ে গেলে যেমন তা ফেলে দিয়ে নতুন বস্ত্র ধারণ করতে হয়, তেমনি পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার সিস্টেম অবশ অব্যবহার্য হয়ে উঠলে তা বাসাংসি জীর্নানির মত হয়ে যায়।”[৯]

জমিদার তারক কৃষক রায় চাষীদের উপর অত্যাচার ও শোষণ চালিয়েছে। তারপর দেশ স্বাধীন হলে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়। অন্যায় ভাবে দখল করা জমির হাত বদল হয়। জমিদার বাড়ির ভগ্নদশা প্রাপ্তি ঘটে। স্বাধীনতার পর দেশ গড়ার বিপুল প্রয়োজনে দুর্গাপুর শিল্পনগরী গড়ে ওঠে। দুঃখের নদ দামোদরের বাঁধ নির্মিত হয়, যোগাযোগের জন্য নদীর উপর সেতু গড়ে ওঠে। হারিয়ে যায় অনেক কিছু, পুরাতন মূল্যবোধ নষ্ট হয়, গ্রামে সমবায় প্রথায় চায, তাঁত শিল্প ও কামার শালার কাজে রুজি রোজগারের প্রয়জনে সংঘবদ্ধতা দেখা যায়। অন্যদিকে জমির চাষের উপর নির্ভরশীল জীবন ত্যাগ করে পানু দাস, ভুবন কামার, মনি, কালী, জমিদার পুত্র জীবন প্রভৃতি অনেকে দুর্গাপুরে নতুন গড়ে। ওঠা কারখানায় কাজের সন্ধানে ছোটে।

ভাললাগা ও ভালবাসার সম্পর্কে স্বৈরিণীমিষ্টি লোহার আর জল টোপ, ভুবন আর কদমবী, বেজা আর লবঙ্গ, অশোক আর প্রীতি ও শিখার জীবনে আলো ছায়ার খেলা দেখা যায়। সম্পর্কের ভাঙা গড়ার খেলায় মিষ্টি লোহার ও ঈশ্বর ডোমের ছেলে সানাই বাদক অবিনাশের নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নদীর একুল ভাঙে তো ওকুল গড়ে ওঠে। বহু ছোট বড় ঘটনা এবং প্রধান অপ্রধান চরিত্রের ভিড়ে বাঁচবার সঞ্জীবনী মন্ত্র খুঁজে পাওয়া যায় উপন্যাসে সামাজিক পরিবর্তনের পর অবিনাশের দেখানো পথে। সমাজের কেউ অদ্ভুত নয়, কাকে দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না, সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে পরিবর্তনকে মেনে নিতে হয়, কালের অপ্রতিরোধ্য গতিকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তাই শেযে উপন্যাসের ঘটনায় দেখা যায় অবিনাশের সানাইয়ে বেজে ওঠে মাটির অন্তরের সুর।

ট্রিলজির শেষ উপন্যাস ‘শেষ নাগ’।

> “বন কেটে সদ্য গড়ে ওঠা ইস্পাত নগরী দুর্গাপুর এর পটভূমিকায়।”[১০]

আদিম অরণ্য পরিবেশে সামন্ততান্ত্রিক জগতের বুকে আসছে নতুন যন্ত্র সভ্যতার প্রকাশ। তার ফলে পুরাতনের সঙ্গে বেঁধেছে নতুনের সংঘাত। সেই সংঘাত নিয়ে এই উপন্যাস। অরণ্যচারী আদিবাসী মানুষেরা সমাজেকতটা পিছনের সারিতে অবস্থান করে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদনীপুরের প্রান্ত সীমায় বসবাসকারী অন্ত্যজ-আদিবাসী মানুষগুলোর জীবনের এক করুণ ছবি এবং অরণ্য সংকটের চিত্র তাঁর উপন্যাসের কাহিনীতে স্পষ্ট। সুদীর্ঘকাল থেকে সমাজে যে শ্রেনি বৈষম্য ও বর্ণ বৈষম্য বিরাজমান তা আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সমাজের নানান সুবিধাভোগ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। রাজগুরু তাঁর সমগ্র জীবনের বেশিরভাগ সময়ই লক্ষ্য করেছেন প্রতারণা-ছলনা শঠতাই বাবু সমাজের মানুষগুলোর ক্ষমতাবান হওয়ার মূল হাতিয়ার। তিনি অরণ্য সংকট ও আদিবাসী মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার প্রকৃত সমঝদার ছিলেন।

তথ্যসূত্র :

১. রাজগুরু, শক্তিপদ, হাতিবোঙার অরণ্য, শাওনি, ৭৩ মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা-৯, প্রকাশ কাল, আষাঢ় ১৩৯৩, পৃ. ১০
২. রাজগুরু, শক্তিপদ, কিছু পলাশের নেশা, সাহিত্য সংস্থা, প্রকাশক রণবীর পাল, প্রথম প্রকাশ জৈষ্ঠ্য ১৩৮৫
৩. রাজগুরু, শক্তিপদ, নীল নির্জন, প্রকাশক শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সাহিত্য মন্দির, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৩৯০, পৃ. ৯২
৪. রাজগুরু, শক্তিপদ, কাঁসাই এর তীরে, অঙ্কুর পুস্তকালয়, টি, ৩১ বি, কলেজরোড, ৭০০০০৯ , প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৪০৩, পৃ. ২১
৫. তদেব, পৃ. ১৪
৬. রাজগুরু, শক্তিপদ, সওদাগর, পত্রভারতী, কলেজ রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০৪, পৃ. ৭
৭. তদেব, পৃ. ১২৮
৮. রাজগুরু, শক্তিপদ, রতনমনি রিয়াং, কিশোর প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১১ পৃষ্ঠা -১৭৬
৯. রাজগুরু, শক্তিপদ, রায়মঙ্গল, নন্দিতা পাবলিশার্স, ৬.এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর, ২০০২ পৃ. ২২
১০. রাজগুরু, শক্তিপদ, শেষনাগ, গ্রন্থপীট, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৯, পৃ. ৩

সহায়ক গ্রন্থ :

১. নাগ, নিতাই, কথা সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে শক্তিপদ রাজগুরু : স্রষ্টা ও সৃষ্টি, সাহিত্যলোক, প্রকাশক নেপালচন্দ্র ঘোষ, পারথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ, ১৪২০, ডিসেম্বর ২০১৩
২. শতবর্ষের আলোকে সাহিত্যিকশক্তিপদ রাজগুরু স্মরণে ওমননে, সম্পাদনায় রাঢ় নবচেতনা, এডুকেশন ফোরাম, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০২১
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১০